Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-IV, April 2019, Page No. 84-90
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মানসিক স্বাস্থ্য ও জীবণ-শৈলীতে মতুয়া ধর্ম

তেজেন মণ্ডল
স্কলার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, এ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Every creature in the world wants to live. People want to live. But till the 19th century, the upper caste people of Bengal have repeatedly deprived the poor people from that opportunity. Unleashing the non-conscious people, the helpless people will fall away from falling-all the roads are open. They have lost their sense of responsibility. They have made all the components of being health. Whose overall way of salvation, the path of the new horizon had emerged for the creation of Harichand Thakur and his Matua religion. He raised the point of view through the Matua religion, the delicate feeling of 'Health is Wealth'.

Basic wards: Health, Character-building, Herbal, Prescription and Matua.

'স্বাস্থ্যই সম্পদ'-সে কথা তখনই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন তা সব ধর্ম, সব বর্ণ, সব শ্রেণীর মানুষ উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তা কথার কথাই থেকে যায়। ছোটোবেলায় সরকারী প্রাইমারী স্কুল গুলোতে প্রত্যেক ছেলে-মেয়ের মঙ্গলের জন্য যে vaccine injection দেওয়া হতো, তা তারা না বুঝেই পালাতো। ভাবতো এসবে তাদের ক্ষতি হবে; মাথা ঘুরবে, মরে যাওয়ারও সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যদিও বাস্তবে তা সত্যি ছিলো না।

মূল কথা হলো-যে যা বোঝে না, তার সামনে একটা ভালো কথা বললে বা একটা ভালো বিষয় উপস্থাপন করলে এবং তা যদি হয় আরো বিনা পয়সায়, তাহলে তার কদর মেলে না; ভুল ব্যাখ্যা হয় বা গোটা বিষয়টাকে বুঝে কিংবা না বুঝে বিকৃত করা হয়। বিশেষতঃ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত অসচেতন গ্রাম বাংলার পিঁছিয়ে পড়া সমাজের মানুষের চৌহদ্দিতে এটা না হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। এরকম বেশীর ভাগ মানুষ হলো মতুয়া। মতুয়া সমাজের মানুষ মূলতঃ কৃষিনির্ভর। কেউ শষ্য ফলায়, কেউ মাছ ধরে, কেউ হাঁস-মুরগী-গরু-ছাগল পালন করে, কেউ নৌকা বানায়, কেউ নৌকা চালায়, কেউ রাজমিস্ত্রী, কেউ ক্ষেতমজুর, কেউ আজকাল কিছু চাকুরী-ব্যবসাও করে। তবে, সেসব খুব বড়ো নয়; অন্ততঃ সমাজের উচ্চবর্ণীয় মানুষের তুলনায় নগন্য। তবে যেটুকুই উন্নতি হোক না কেনো কারিগর সেই হরিচাঁদ-গুরুচাদ ঠাকুর। তাঁরা মতুয়া ধর্মের মাধ্যমে পতিত মানুষকে জাগিয়ে তুলেছেন। শিক্ষিত, সচেতন করেছেন।

'তপশীল-জাতি মধ্যে যা' কিছু হয়েছে।
হরিচাঁদ-কল্পবৃক্ষে সকলি ফলেছে।।
হরি-কল্পবৃক্ষে ফলে সঞ্জীবনী ফল।
সে ফল বিলায় গুরু পরম দয়াল।।

সে-গুরু পরম-গুরু গুরুচাঁদ নাম।
শত কাশী তুল্য যার ওড়াকান্দী ধাম।।[১]

মতুয়া ধর্মের স্রষ্টা হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলায় ধর্ম, বর্ণ, জাতপাত, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার, ব্যভিচার জর্জরিত হয়ে ওঠে। হিন্দু ধর্মের উচ্চবর্ণ দ্বারা নিম্নবর্ণ ভয়ঙ্কর অমানবিক আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রতি ক্ষেত্রে শোষণ যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সুস্থ্য ভাবে বেঁচে থাকা তাদের পক্ষে দূরুহ হয়ে ওঠে। অশিক্ষা, দারিদ্রতা, অপুষ্টি যেনো লেগেই থাকে। কুসংস্কার, ঝাড়ফুক, তাবিজ-কবজ নিত্য সঙ্গী। রোগ-ব্যাধি হলে মোটের উপর ভরসা উপরওয়ালা আর প্রাকৃতিক কিছু গাছ-গাছড়ার কেরামতি। কিন্তু তাওতো জানা দরকার। অজপাড়া গাঁয়ের মানুষ ওসব যে মোটে জানেনা, তা নয়। তবে নানা রোগের নানা গাছপাতা, সবতো আর মনে থাকে না; চর্চাওতো লাগে। যেটা গভীর ভাবে শুরু করেছিলেন পতিত, দলিত সমাজের প্রাণপুরুষ হরিচাঁদ ঠাকুর এবং তাঁর পরবর্তীকালে তাঁর সুযোগ্য পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর। তাঁরা বলেন, 'আমাদের আগে খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই, বাসস্থান চাই, চিকিৎসা চাই, সমাজে সম্মান চাই। মোটকথা যা যা থাকলি জীবণ সুন্দর হয়, তার সব কিছু আমাগার নাগালে পেতি চাই।'[২] তাঁরা জানতেন, সমাজের পিঁছিয়ে পড়া মানুষের এই পৃথিবীতে সুস্থ্য-সবল ভাবে বেঁচে থাকতে হলে আগে দরকার চেতনা, আত্মসচেতনতা।

'কিবা শূদ্র কিবা ন্যাসী কিবা যোগী হয়।
যেই জানে আত্মতত্ত্ব সেই শ্রেষ্ঠ হয়।[৩]

অথচ তা তাদের ছিলো না। শ শ হাজার হাজার বছর তারা এলোমেলো অবস্থায় পড়ে আছে প্রান্তিক এলাকায়। উন্নয়ণ হয়নি। সমাজের শিক্ষিত উচ্চবর্ণীয়রা তাদের দূরে ঠেলে দিয়েছে, অযুক্তি, কুপরামর্শ দিয়েছে, সমস্ত ক্ষেত্রে শোষণ করেছে, ভেদাভেদ করে নিম্নগামী করেছে। যতো ভেদাভেদ, ততোই স্বার্থান্বেষীদের লাভ। আজ তারা অচল, দূর্বল, পরনির্ভরশীল। কথায় কথায় কপাল চাপড়ায় আর ঈশ্বর ডাকে। যদিও কেউ তাঁকে কখনো দেখেনি। তবুও রাতদিন তারা কাজকর্ম ফেলে ঈশ্বরের কাছে কাঁদে, ফুলমালা, খই, বাতাসা নিবেদন করে। কিন্তু কী মঙ্গল হয়, তা তারা বলতে পারেনা। এটাই তাঁদের দুঃখ-দূর্দশার মূল রোগ, যা গুরুচাঁদ ঠাকুর ধরে ফেললেন। তিনি বললেন-

'কান্দাকান্দি ঢলাঢলি কতকাল করে এলি
কিবা ফল পেলি তা'তে বল?
কর্ম ছেড়ে কান্দে যেই তার ভাগ্যে মুক্তি নেই
হ'বি নাকি বৈরাগীর দল?[৪]

স্বাস্থ্য মানে মানসিক ও শারিরীক দুই অবস্থাকেই বোঝায়। মানসিক অবস্থা ভালো না থাকলে যেমন শরীর ভালো থাকে না, তেমনি শরীর খারাপ হলেও মন-মানসিকতা ভালো থাকে না। পতিত সমাজের মানসিক ও শারিরীক দুটি ক্ষেত্রেই অন্যান্যদের তুলনায় কম জোরী হয়ে যায়। ভালো ডাক্তার নেই। গ্রামে থাকে বেশীর ভাগ মানুষ বসবাস করে উচ্চবর্ণদের ব্যাখ্যা অনুসারে- চন্ডাল, অস্পৃশ্য। তাদের নাকি ছোঁয়া যায় না, ধরা যায় না, তাই তাদের দেখাশুনার ডাক্তার কোথায় ! তাই প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা মানুষের প্রকৃতির গাছ-গাছড়াই বেঁচে থাকার একমাত্র সম্বল, কিছু বিশেষ চিন্তাভাবণা যুক্তিনিষ্ঠ সম্বলিত আদপ-কায়দা আর সাংগঠণিক পদ্ধতিতে আত্মশক্তি উন্মোচিত করা প্রয়োজন হয়ে উঠেছিলো ঊনবিংশ শতাব্দির দোর গোড়ায়। তাই গুরুচাঁদ ঠাকুর ঘোষণা করলেন-

'স্বাস্থ্যহীন জাতি নাহি পায় গতি
আত্মশক্তি কর রক্ষা।
শিক্ষা স্বাস্থ্য পেলে- অজেয় ভূতলে-
আর কিবা লাগে ভিক্ষা?[৫]

হরি-গুরুচাঁদ, মানুষের দৈনন্দিন জীবণে যা যা সুঅভ্যাস করলে সুস্থ্যতা ফিরে আসে, তারজন্য সংসারের প্রচলিত আচারআচরণের কিছু যুক্তিনিষ্ঠ নিত্যনৈমিত্তিক চর্চা বা অনুশীলন গড়ে তোলার কথা বললেন। মজবুত শিক্ষা ও সুচরিত্র গঠণের কথা বলেন। আবার ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার কথাও বলেন। তিনি বলেছেন-

'পবিত্র চরিত্র যেই তার কোন তুল্য নেই
হোক না সে জন্মগত ক্ষুদ্র বা মহান।[৬]

নরম বিছানা বাদ দিয়ে চাটাইতে শোবে। অল্প ঘুমাবে। কারণ, অতি নিদ্রা মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে বিছানা ছাড়বে।[৭]

নরনারী অবশ্যই প্রাতঃস্নান করবে। তাতে দেহ-মন শুদ্ধ হয়। সারাদিনের কাজে স্ফূর্তি আসে।[৮] সিদ্ধ চালের ভাত খাবে। তাহলে শরীর নীরোগ ও তেজদীপ্ত হয়।

'গড়া-সিদ্ধ চাল খেয়ে চাটায়ে শয়ন।
সে-বীর্যে জন্মিবে ধ্রুব তেজস্বী নন্দন।।[৯]
মোটকথা, সকলকে শক্তিশালী হতে হবে।
'শক্তি না দেখিলে কেহ করেনা সম্মান।
শক্তিশালী হ'তে সবে হও যত্নবান।।[১০]

তিনি বললেন-

'ভাব' মনে নহি ক্ষুদ্র বীর্যবান নমঃশূদ্র
একতালে সবে পা ফেলাও।।
কুসংস্কার আছে যত দূর কর' অবিরত
বিদ্যা শিক্ষা কর ঘরে ঘরে।[১১]

ঘরবাড়ি, বিছানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখবে, এমন ভাবে সুনিপুন ভাবে সাজিয়ে রাখবে, যাতে তা দেখে মনে হয় পুণ্যতীর্থ ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছি।[১২]

শৌচাচারে পবিত্র থাকবে। সুন্দর করে পায়খানা-রাস্তাঘাট বানাবে এবং তা যেনো ছোটো-খাটো বা ব্যবহারের অনুপযুক্ত না হয়।

'স্নান দানে শৌচাচারে সুসভ্য হইবে।
অপবিত্র ভাবে কেহ কভু না চলিবে।।[১৩]

বিলাস জীবণ-যাপন কাটাবে না, তাতে শরীর-মন দূর্বল হয়ে যায়। নানা রোগের মুখোমুখি হতে হয়। সোজা-সাপ্টা সরল জীবণ-যাপন করবে।[১৪]

মদ, গাজা, খাবে না, চুরি করবে না, মিথ্যা বলবে না। তাস, দাবা, জুয়া এসব খেলবে না। নারী দিয়ে অঙ্গ সেবা করবে না।[১৫]

পর পতি ও পর সতী একে অন্যকে শ্রদ্ধা জানাবে। যদি তারা ইন্দ্রিয় বশ না করে, তাকে ব্যভিচার বলে। ব্যভিচারী মানে দিনে দিনে ক্ষয়, জরা, ব্যাধী এবং মৃত্যুকে নিজে থেকে ডেকে নিয়ে আসা।[১৬] ঋতুকালের আগে নারীসঙ্গ করবে না। তাতে সহধর্মিনীর শরীর ও মনে কুপ্রভাব পড়ে। সংসারে নেগেটিভ ছায়া পড়ে, সংসার ভেঙে যায়।[১৭] ঋতুর প্রথম তিন দিন নারীসঙ্গে যাবে না। প্রাকৃতিক নিয়মে এই সময় তারা অস্বাভাবিক থাকে। ষোলো

দিনের পরে একদিন মাত্র নারীসঙ্গ করবে। তার বেশী হলে সেটাকেও ব্যভিচার বলে।[১৮] অধিক যৌন মিলন স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়। গুরুচাঁদ ঠাকুর নিজে মাত্র পাঁচবার স্ত্রী গমন করেছেন। সেই পাঁচবারেই পাঁচ সন্তানের পিতা হয়েছেন।[১৯] প্রত্যেক পুরুষ রতিশাস্ত্র মেনে নারীসঙ্গ করবে। তাতে সংসারে অশান্তি আসেনা।[২০]

ব্যভিচারীরা লজ্জা কিংবা ভয়ে ভ্রুণহত্যা করলে তারা পাপের আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছাঁই হয়ে যাবে।[২১]

ছেলে-মেয়ের বাল্যবিবাহ দেবে না। তাতে স্বাস্থ্যহানী ঘটে, অঙ্কুরেই সব বিনষ্ট হয়ে যায়। অপরিপক্ক গাছে অপুষ্টিকর ফল জন্মায়। পরিবারের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্র দূর্বল হয়ে যায়।[২২]

কথায় কথায় ভয় পাবেনা, মরার আগে মরবে না। ভয় পেলে ভয় আসে। বীর জাতি প্রথমে লড়ে, তারপর মরে।

'যে-বিপদ আসে নাই তারে কেন ডরি?
মরণের ভয় দেখে কেন ভয়ে মরি।।
বীর ধর্মে নাহি কিছু ভয়ের আশ্রয়।
কাপুরুষের মৃত্যু-পূর্বে শত-মৃত্যু হয়।।[২৩]

বিখ্যাত কবি শেক্সপিয়ার বলেছেন- *'Cowards die many times before their deaths.*[২৪]

গুরুচাঁদ ঠাকুর মনে করেন, যে সয় সে মহাশয়। সব কিছুতে উন্মাদনা করা ঠিক নয়। আত্ম সংযমের মাধ্যমে কাজ হলে তাতে অনেক বেশী উন্নতি ফলে।

'ধৈর্য শক্তি না থাকিলে সকলি বিফল।
ধৈর্য ধর কর্ম কর প্রাণে হবে বল।।[২৫]

আজ ডাক্তাররা মর্নিংওয়াকের কথা বলেন। ডাক্তারী না পড়েও হরিচাঁদ ঠাকুর হাঁটার সুফল জানতেন।[২৬] ডাক্তারী শাস্ত্রেই বলেছে, যদি কোনো রোগী চিকিৎসায় আত্মবিশ্বাস খুঁজে না পায়, তাহলে সেই রোগীকে ভালো করা কঠিন। কিন্তু অসুস্থ্য হয়েছে এবং পাশাপাশি এটাও মনে মনে ভাবে আমার চিকিৎসা ঠিকমতো চলছে, তাহলে সেই রোগী তাড়াতাড়ি সুস্থ্য হয়ে উঠবে। হরিচাঁদ ঠাকুর রোগীদের এমন আত্মতুষ্টি যেমন দিতেন,[২৭] তেমনি জ্বরের রোগীদের তিনি সহজলভ্য ওষুধ দিতেন পান্তাভাত, পোঁড়া লঙ্কা আর তেঁতুলগোলা জল খাওয়া এবং সেই সাথে খাটাখাটনি করা। তিনি বলতেন, রোগ মুক্তি চাও? তাহলে যে রোগের যাতে বৃদ্ধি, তাই গিয়ে খাও কিংবা করো।[২৮] আর গুরুচাঁদ ঠাকুর জ্বরে পথ্য দিতেন-

'পান্তাভাত প্রাতঃকালে উদর পূরিয়া।
ইলিশ মাছের সঙ্গে খাবে মাখাইয়া।।[২৯]

ঊনবিংশ শতাব্দিতে পল্লী- গাঁয়ে ভয়াবহ কলেরা মহামারী আকার ধারণ করে। দরিদ্র মানুষ দিশাহীণ ভাবে গুরুচাঁদ ঠাকুরের শরণাপন্ন হন। তখন তিনি কলেরা রোগীদের পান্তা ভাত খাওয়ার পরামর্শ দেন। কেননা, পান্তা ভাতে এ্যাসিড থাকে, যা কলেরার জীবাণু নাশকের কাজ করে। এটি কোনো মন্ত্র-তন্ত্রের বিষয় নয়; স্রেফ বিজ্ঞান।[৩০]

সাধারণ হাতের নাগালে পাওয়া যায় এমন সব ফল-ফলাদি, লতা-পাতা, গাছ-গাছড়া দিয়ে হরিচাঁদ ঠাকুর নিজস্ব কায়দায় যে দেশজ, বনৌষধি চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শি হয়ে উঠেছিলেন, তার প্রায় সবটাই গুরুচাঁদ ঠাকুর শিখেছিলেন এবং অসহায় দরিদ্র মানুষের দূঃসময়ে কল্পতরুর মতো হয়ে উঠেছিলেন।

সন্তানের জন্ম হলে তিনি বিধান দিতেন বাচ্চাকে আঠারো মাস পর্যন্ত খাঁটি তিলের তেল সারাদেহে মালিশ করবে। আর প্রসূতির শরীরে ভোরবেলায় সারা শরীরে মাখাবে আদার রস মেশানো সরষের তেল। তেল ও আদার পরিমাণ হলো- এক সের (কেজি) খাঁটি সরষের তেল ও এক পোয়া (250gm) আদা।

মেয়েদের বাধক বেদনা হলে সন্তান হওয়ার সম্ভাবণা প্রায় কম থাকে। তাই তাদের জন্য বিধান দিতেন-লঙ্কা-তেঁতুল মেশানো জল। পরিমাণ হলো- শুকনো লঙ্কার গুড়ো চার-পাঁচটি, আধাপোয়া (125gm) তেঁতুল এবং জল এক পোয়া (250gm).

মেয়েদের সূতিকা রোগে বলতেন- শিঙি মাছ আর গন্ধবাবলার পাতা দিয়ে রান্না করা ঝোল ভাত খাবে, অথবা দয়াকলার (বিচিকলা) মোচা পুড়িয়ে সরষে বাটা দিয়ে ভাত খাবে। অথবা লোহাশাকের ঝোল খাবে। আর গায়ে আদার তেল মাখবে। কিন্তু মাছ, মাংস, শাক এবং গুরুপাক খাবার খাবে না।

শুকনো রোগে বলতেন- চিঁড়ে দোভাজা করে তাতে মিষ্টি না দিয়ে শুধুমাত্র সন্ধব লবণ দিয়ে পায়েস বানিয়ে খাবে।

আমাশয় হলে বলতেন-সকালে খালি পেটে বেল পোড়াতে চিনি মিশিয়ে ঘোল বানিয়ে খাবে এবং থানকুনি পাতার পিঠে বানিয়ে খাবে।

জ্বরে বলতেন- গায়ে ভালো করে সরষের তেল মাখিয়ে স্নান করবে। তারপর বাতাবিলেবু কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মাখিয়ে খাবে। গরম ভাতে মুগডাল, তেঁতুলপাতার টক খাবে। আখের রস খাবে।

সান্নিপাত জ্বরে বলতেন- সকালে সদ্য দোহন করে নিয়ে আসা আধাসের গরুর দুধ একদম গরম অবস্থায় খাবে। সকাল-দুপুর দু'বার খাঁটি সরষের তেল গায়ে মেখে স্নান করবে। তারপর বাতাবিলেবুতে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে খাবে। এছাড়া, মুগডাল, তেঁতুলপাতার টক, আখের রস, কচিডাব, কমলা খাবে।

হাঁপানিতে বলতেন- সকালে গায়ে আদা দেওয়া সরষের তেল মেখে স্নান করবে। তারপর শবরীকলা এবং পুরনো তেঁতুল একসাথে মেখে খাবে। কাঁচা দুধ খাবে।

বাত রোগে বলতেন-খুব সকালে সদ্য দোহন করা গরম কাঁচা দুধ খাবে। কচ্ছপের মাংস (তখন এটি খাওয়া আইনের চোখে অপরাধী না হলেও বর্তমানে অবৈধ), চালতার টক খাবে। আর খাঁটি সরষের তেলের মধ্যে শুকনো লঙ্কার গুড়ো মিশিয়ে সেই তেল রৌদ্রে বসে সারা গায়ে মাখাবে। এছাড়া, সরষে, শুকনো লঙ্কা, চালতার খোসা আলাদা ভাবে বেটে- পরে এগুলি একসাথে মিশিয়ে ব্যাথা জায়গায় প্রলেপ লাগাবে।

জন্ডিস বা ন্যাবা রোগে বলতেন- দিনে দু'বার স্নান করবে। ডাবের জল ও আখের রস মিশিয়ে খাবে। দই বা ঘোল দিয়ে ভাত খাবে।

গায়ে চুলকানি রোগে বলতেন- খুব সকালে উঠে আগে স্নান করবে। তারপর কাঁচা হলুদ ও নিমপাতা বেটে গায়ে মাখাবে। দুপুরেও স্নানের পর তাই করবে।

দাদ হলে বলতেন- দাদের উপর তিল বেটে অথবা তিলের তেল লাগাবে। এছাড়া, দুধের ফ্যানা লাগাবে।

টনসিল ব্যাথায় বলতেন- তালমিছরী চুষে খাবে। আর তেঁতুল, পোঁড়া মাটি ও লবণ একসাথে মিশিয়ে ফোলা জায়গায় প্রলেপ দেবে।

শিশুদের পেটে ব্যাথায় বলতেন- তলপেটে নাভীর নিঁচে নীল(শক্ত যে নীল) ঘসে দেবে।

দুই-তিন বছরের শিশুর প্লীহা হলে বলতেন- ঝুনো নারকেল খেঁজুর গুড় দিয়ে খালি পেটে যতোটা পারে খাবে। তিন বছরের বেশী হলে বলতেন- খালি পেটে তিলের ছাতুতে চিনি-কলা মিশিয়ে খাবে। সাত বছরের বড়ো হলে বলতেন- কচ্ছপের মাংস, বোয়াল মাছ বা পুঁটি মাছ, চিংড়ি, ইলিশ, চালকুমড়ো, পান্তা ভাত খাবে।

প্রস্রাব বন্ধ হলে বলতেন- নাভীতে পলিমাটির প্রলেপ দেবে।

ক্রিমি রোগে বলতেন- খুব সকালে কিছুদিন খালিপেটে হলুদ গুড়ো আর খেঁজুর গুড় মিশিয়ে খাবে।

অজীর্ণ হলে বলতেন- ভাত খাওয়ার শেষে পান-জোয়ান, শুধু জোয়ান অথবা আদা খাবে। এছাড়া, ভাত খাওয়ার পরে ত্রিফলার (আমলকি, হরিতকি ও বহেরা) বড়ি বানিয়ে খাবে।

পাগল বা উন্মাদ হলে বলতেন- নাক দিয়ে জল টানাতে হবে। সকালে একমাস যাবৎ ডাবের জল ও আখের গুড় মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। মাথায় তেঁতুলের প্রলেপ দেবে এবং দিনে দু'তিনবার স্নান করাবে।[৩১]

বর্তমান আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান তখনকার হরি-গুরুচাঁদের চিকিৎসা ভাবনাকে কতোটা গুরুত্ব দেবে, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। তবে, বাস্তবসম্মত এবং বড়ো কথা হলো- তাঁদের প্রয়াসে ওড়াকান্দি ও তার সংলগ্ন গ্রামীন পরিমন্ডলে যে অর্থহীণ সহায়সম্বলহীণ শিক্ষাহীণ চেতনাহীণ পতিত দলিত সমাজের মানুষের আত্মশক্তি, সুস্থ্য চরিত্র গঠণ ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় ভরসা যুগিয়ে বেঁচে ছিলো, তা প্রমাণিত।[৩২] সারাদেশে আজকের চাঁদসী চিকিৎসা দেখা যায়, তার আবিষ্কার ও তার সাফল্য কিন্তু পতিত-দলিত চাঁদসী গ্রামের নমঃশূদ্র মানুষেরই।[৩৩] তা যদি না হতো তাহলে কবেই এলাকার মানুষ সাফ হয়ে যেতো! কিন্তু তা হয়নি। বরং দিনে দিনে ওড়াকান্দি ঠাকুরবাড়িতে নিটোল, নিরোগ, শক্ত সামর্থ মতুয়া ভক্তের আগমণ ঘটেছে অনেক বেশী। মনের আশা পূর্ণ হওয়ার জন্য কারো মানত করা 'জরিমানা' বা 'হাজত' কেউ দেয় পাঁচ সিকি (এক টাকা পঁচিশ পয়সা), কেউ সোয়া পাঁচ আনা (পাঁচ পয়সার একটু বেশী), যার যেমন রোগমুক্তি, তার তেমন 'হাজত'। মাস বা বছরের শেষে যোগ করলে প্রচুর আর্থিক উন্নতি হয়েছে, যা সামগ্রিক মতুয়া উন্নয়ণে কাজে লেগে যায়।[৩৪]

তথ্যসূত্র:

১। হালদার, আচার্য মহানন্দ, শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত, ২০০৯,পঞ্চম সংস্করণ, ঠাকুরনগর, শ্রী কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, পৃ. ১৪৫.
২। ব্যাপারী, মনোরঞ্জন, মতুয়া এক মুক্তি সেনার নাম, ২০১৮, প্রথম প্রকাশ, নিষাদ, কোলকাতা-৪৭, অভিরূপ সেন, পৃ. ৫৯৭.
৩। বৈরাগ্য, ডঃ বিরাট, মতুয়া সাহিত্য পরিক্রমা, ১৯৯৯, মতুয়া গবেষণা পরিষদ, হৃদয়পুর, ডাঃ পরিমল বৈরাগ্য, পৃ. ৩৯.
৪। হালদার, আচার্য মহানন্দ, শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত, ২০০৯,পৃ. ২০৮.
৫। তদেব, পৃ. ১৩১.
৬। তদেব, পৃ. ৭৩.
৭। তদেব, পৃ. ৫৭৩.
৮। তদেব, পৃ. ৫৬৯.
৯। তদেব, পৃ. ৫৭৩.
১০। তদেব, পৃ. ৫৭৩.
১১। তদেব, পৃ. ১১৯.
১২। তদেব, পৃ. ৫৭৪.
১৩। তদেব, পৃ. ৫৬৯.
১৪। তদেব, পৃ. ৫৭৩.
১৫। তদেব, পৃ. ৫৭৪.

১৬। তদেব, পৃ. ১৪.
১৭। তদেব, পৃ. ১৫.
১৮। তদেব, পৃ. ১৫.
১৯। ব্যাপারী, মনোরঞ্জন, মতুয়া এক মুক্তি সেনার নাম, পৃ. ৬৪৭.
২০। হালদার, আচার্য মহানন্দ, শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত, ৫৬৮.
২১। তদেব, পৃ. ৫৬৮.
২২। তদেব, পৃ. ২৫৩.
২৩। তদেব, পৃ. ১৬৬.
২৪। তদেব, পৃ. ১৬৬.
২৫। তদেব, পৃ. ৪৮.
২৬। ব্যাপারী, মনোরঞ্জন, মতুয়া এক মুক্তি সেনার নাম, পৃ. ৪৯৮.
২৭। তদেব, পৃ. ৪৯৯.
২৮। তদেব, পৃ. ৪৯৯.
২৯। হালদার, আচার্য মহানন্দ, শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত, পৃ. ২৬৩.
৩০। বিশ্বাস, মনোহরমৌলি, গুরুচাঁদ ঠাকুর: বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ আলোকে, প্রবন্ধে প্রান্তজন: অথবা অস্পৃশ্যের ডাইরি, ২০১০, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা-৭৩, দেবাশীষ মন্ডল, পৃ. ১৪২.
৩১। ব্যাপারী, মনোরঞ্জন, মতুয়া এক মুক্তি সেনার নাম, পৃ. ৬৩৭-৬৩৮.
৩২। তদেব, পৃ. ৬৩৮.
৩৩। তদেব, পৃ. ১৪৯.
৩৪। তদেব, পৃ. ৬৩৮.